Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-III, April 2021, Page No.73-80
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সংযোগ এবং সংযোগ বিদ্যা: আধুনিক শিক্ষায় ব্যবহারিক গুরুত্ব

ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত

Abstract:
In today's world, communication studies have become as important as other subjects. Extensive research is being conducted both domestically and internationally in this field. While communication generally refers to the expression of thoughts and feelings, the art of speaking and utilizing various methods for effective communication has evolved into a sophisticated practice. The more adept someone is at expressing ideas, the better they can be as a communicator. However, many people lack a clear understanding of what communication studies truly encompass. Although there is considerable research on this subject abroad, it has not gained much prominence in our country. Particularly in Bengali, since this topic was not included in any university curriculum, there has been little opportunity for discussion in this language. In this article, we will attempt to briefly discuss the main aspects of communication covered in academic curricula today, the types of methods used, and their practical outcomes.

Keywords: communication, expressing ideas, Mass Communication.

'Communication'কে বাংলায় বলা যায় 'সংযোগ', শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ **'Communis'** থেকে; যার ইংরেজি অর্থ **'to share'**। বাংলায় যার আভিধানিক অর্থ 'ভাগ করা'। মানুষ প্রতিমুহূর্তে তার মানবিক ভাবনা, আবেগ, চিন্তা, চেতনা প্রভৃতি অন্যের সাথে ভাগ করে নেয়। সেটি যেমন মৌখিক হতে পারে তেমনি তা হতে পারে অমৌখিক কিংবা অভিব্যক্তিমূলক। কিন্তু তার পেছনে মূল যে জিনিসটি রয়েছে তা হল যা বলতে চাওয়া হচ্ছে তা অপরকে বোধগম্য করা। আমরা প্রতিমুহূর্তে নানা পদ্ধতির মাধ্যমে নিজের ভাবনা চিন্তাকে অন্যের কাছে ছড়িয়ে দেই। কথা বলা, টেলিফোন, ব্লগ, ওয়েবসাইট, দূরদর্শন, বেতার, ই-মেইল, কলা, মৌখিক কিংবা দৈহিক নানা অঙ্গভঙ্গি অথবা বক্তৃতা প্রভৃতি নানা মাধ্যমের দ্বারা আমরা আমাদের ভাবনাকে অন্যের কাছে প্রসারিত করি। ভাল সংযোগ তখনই স্থাপিত হয় যখন বক্তা এবং শ্রোতা একজন আরেকজনকে বুঝতে পারে, সেটি মৌখিক কিংবা অমৌখিক (Verbal and Non Verbal) হতে পারে।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান, মতামত, পারস্পরিক ধ্যানধারণা আদান প্রদানকে সংযোগ বলা হয়। সংযোগ মূলত দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। সংযোগের দ্বারা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলার ক্ষেত্রে সংযোগের ভূমিকা অপরিসীম। সংযোগের দুটি পদ্ধতি রয়েছে- একক সংযোগ এবং দ্বৈত সংযোগ।

আজকের দিনে অন্যান্য বিষয়ের মতো সংযোগ বিদ্যাও (Communication Study) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশে এবং বিদেশে এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলছে। সাধারণভাবে সংযোগ বলতে মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ বুঝালেও কথা বলা কিংবা সংযোগ সাধনের নানা মাধ্যম ব্যবহার করা আজ আর্টের পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। যার যত ভাব প্রকাশে দক্ষতা থাকবে সে ততোই ভালো সমন্বয়সাধক (Communicator) হতে পারে। সংযোগ বিদ্যা আসলে কি সে সম্বন্ধে অনেকেরই স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। বিদেশে তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হলেও আমাদের দেশে সেটি তেমন বিস্তার লাভ করেনি। আর বিশেষত বাংলা ভাষায় যেহেতু এই বিষয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত ছিল না তাই বাংলায় এ বিষয়ে খুব একটা আলোচনা করার অবকাশ গড়ে উঠেনি। আজকের দিনে একাডেমিক পাঠ্যক্রমে সংযোগের মূলত কোন দিকগুলো আলোচিত হয়, কি ধরণের পদ্ধতি এবং তার ব্যবহারিক ফলাফল কি আমরা এই বিষয়গুলি উক্ত গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

সংযোগ বিদ্যা (Communication Study):

পাশ্চাত্যের গবেষকদের গবেষণায় দেখা গেছে এই বিষয় সম্বন্ধে মানুষের মনে নানারকম প্রশ্ন কাজ করে। সাধারণ মানুষ কিংবা এই বিষয় বহির্ভূত অন্যান্য বিভাগের গবেষকদের মনেও নানা ধরনের ভাবনার জন্ম দেয়। যেমন- 'এখানে কি বেতার কিংবা দূরদর্শন নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়?' 'সভায় ভাষণ দানের বিভিন্ন পদ্ধতি কি শেখানো হয়?' 'কম্পিউটার এর মাধ্যমে কি শিক্ষা দেওয়া হয়?' 'এখানে কি সাংবাদিকতা (Journalism) ও জনসংযোগ (Mass Communication) শিক্ষা দেওয়া হয়?' তবে বেশিরভাগের মনেই একটি প্রশ্ন কাজ করে 'এটি মূলত কি?' আমরা যেহেতু সংযোগবিহীন হয়ে বাঁচতে পারি না তাই প্রত্যেকেরই এই বিষয়ের উপর একটি প্রাথমিক ধারণা আছে কিন্তু একাডেমিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা কোথায় এ সম্বন্ধে বেশিরভাগেরই কোন ধারণা নেই।

ব্রুচ স্মিথ (Bruice Smith), হারল্ড লাসওয়েল (Harold Lasswell), এবং রালফ্ ডি কাসি (Ralph D. Casey) খুব সুন্দরভাবে এবং সহজভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন যে আসলে সংযোগ বিদ্যা কি? তাঁদের মতে সংযোগ বিদ্যা মূলত যে উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তা হল **'কে কী বলছেন কোন মাধ্যমের ব্যবহার করে এবং কাদের উদ্দেশ্যে বলছেন ও তার পদ্ধতি কিংবা ফলাফল কী'**।
তাদের দেওয়া ইংরেজি সংজ্ঞাটি হল:

> "Who says what, through what channels (media) of communication, to whom, (and) what will be the result" [১]

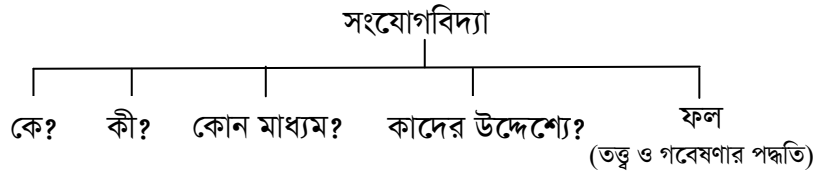

১৯৪৬ সালে লেখক ত্রয়ী এই সংজ্ঞা প্রদান করলেও আজকের দিনেও সংযোগ বিদ্যা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রধান সংজ্ঞা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আমরা মূলত এই সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই আমাদের আলোচনাকে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করব। আমরা প্রথম অধ্যায়ে মূলত দেখার চেষ্টা করব কিভাবে সংযোগ বিদ্যার ধাপে ধাপে ঐতিহাসিক অগ্রগতি ঘটেছে।

সংযোগের সংজ্ঞা:

সংযোগবিদ্যা নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেছেন অ্যারিস্টটল। তারই সূত্র ধরে পরবর্তীকালে অনেক তাত্ত্বিক এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। অ্যারিস্টটল এর সংজ্ঞা অনুযায়ী সংযোগ বিদ্যা হল:

> "Rhetoric falls into three divisions, determined by three classes of listeners to speeches. For the three elements in speech-making—speaker, subject and person addressed—it is the last one, the hearer that determines the speeches end and subject"[২]

Lee এর সংজ্ঞা অনুযায়ী সংযোগ হল:

> "More concerned about ourselves as the communications source, about our message, and even the channel we are going to use. Too often, the listener, viewer, reader fails to get any consideration at all."[৩]

হোভলান্ড (Hovland), মরিস (Morris), নিলসেন (Nilsen), সাপির (Sapir), শ্রেম (Schramm), স্মিথ (Smith), স্টিভেন্স্ (Stevens) নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী যেমন সংযোগের সংজ্ঞা দিয়েছেন তেমনি আজও নিত্য নতুন ভাবনা তৈরি হচ্ছে। তাই সর্বসম্মতভাবে কোন সংজ্ঞাকে গ্রহণ করা যেমন কঠিন তেমনি কোনো তাত্ত্বিকের ধারণাকেই আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। মিডিয়া তাত্ত্বিক ফ্রাঙ্ক ড্যান্স (Frank Dance) ১৯৮৪ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে সাহিত্যে মোট ১২৬টি সংজ্ঞার কথা বলেছেন।[৪] আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে তার সংখ্যা যে আরো বেশি হবে। নিম্নে আমরা সংযোগের কয়েকটি মডেল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা চেষ্টা করছি।

অ্যারিস্টট্ল মডেল (Aristotle Model):

অ্যারিস্টট্ল খ্রীঃপূঃ ৩০০ বৎসর আগে সংযোগের সে সূত্র প্রদান করেছিলেন তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি মূলত মৌখিক (oral communication) সংযোগের কথা বলেছিলেন। সংযোগ বিদ্যা পাঠকে তিনি বলেছিলেন আলংকারিক অর্থাৎ Rhetoric এবং এটি তিনটি উপাদানের কথা বলে। এগুলি হল- **বক্তা, বিষয় এবং শ্রোতা কিংবা দর্শক**। এখানে তৃতীয় উপাদানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বক্তার বিষয়বস্তুর গুণাগুণ নির্ধারণ তারাই করেন। অনেক সময় বক্তার ধারণা থাকে না যাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে তাদের সম্পর্কে। তাই তিনি যখন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন তখন উপস্থিত শ্রোতা তথা দর্শককে আকর্ষিত করতে পারে না। বক্তাকে শ্রোতার মানসিক ভাবনাকে যাচাই করতে হবে আগে তারপরই তিনি বক্তব্য বিষয় উপস্থাপন করবেন, নতুবা সংযোগ ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

লাসওয়েল মডেল (Lasswell's Model):

রাজনীতি বিজ্ঞানী হারল্ড লাসওয়েল সংযোগ বিদ্যার যে মাধ্যম বিকশিত করেছিলেন সেখানে তিনি সংযোগের চারটি উপাদানের কথা বলেছেন। লাসওয়েল এর মতে সংযোগের উপাদান হল:

"Who say's what in which channel to whom with what effect"[৫]

লাসওয়েল বলেছেন যদি সংযোগ সাধিত হয় তাহলে তার একটি প্রভাব অবশ্যই থাকবে। আমরা যদি সংযোগ সাধনে সক্ষম হই তাহলে তার দ্বারা আমরা কাউকে অনুপ্রাণিত করতে পারি এবং এর অবশ্যই একটি প্রভাব থাকবে। লাসওয়েল মডেলেরও চারটি উপাদান রয়েছে যা আমাদের কৌতূহলের উদ্রেক করে- 'who', 'what', 'channel' এবং 'whom'। অ্যারিস্টট্ল মডেল-এ রয়েছে বক্তা (who), বিষয় (what) এবং যাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে (whom)। লাসওয়েল শুধুমাত্র একটি নতুন উপাদানের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আধুনিক তাত্ত্বিকরা সংযোগের এই চারটি উপাদানের কথাই বলেছেন, যদিও অনেকক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিভাষা ভিন্ন হয়েছে।

শ্যানন এবং ওয়েভার মডেল (The Shannon and Weaver Model):

শ্যানন এবং ওয়েভার ১৯৪৯ সালে 'The Mathematical Theory of Communication' নামে একটি বই প্রকাশ করেন, সেখানে সংযোগকে তারা একটি গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। যা লিনিয়ার মডেল (Linear Model) হিসাবেও পরিচিত। এই সূত্র বলা হয়েছে সংযোগের প্রধান কাজ হল– কোন একটি বার্তাকে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ছড়িয়ে দেওয়া। দূরদর্শনে বসে কোনও কিছু দেখা তার একটি অন্যতম উদাহরণ হতে পারে। যখন আমরা দূরদর্শন (Sender) দেখি তখন আমাদের ভূমিকা গ্রহীতা (Receiver) হিসাবে কাজ করে।

গাণিতিক বা লিনিয়ার মডেল মূলত একরৈখিক দিক নির্দেশ করে। প্রেরক (Sender) সঙ্কেতাকারে (encodes) বার্তা প্রেরণ করে, কোন একটি মাধ্যমের দ্বারা (মৌখিক/অমৌখিক সংযোগ) গ্রহীতার কাছে; গ্রহীতা তখন সেই বার্তা গ্রহণ করে নিজের মত করে মতামত প্রদান করতে পারে। এই ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক ধ্বনি (noise) মূল বার্তা প্রেরণে ও গ্রহণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে।

- **একজন প্রেরক যে কোন কেউ হতে পারেন যিনি সঙ্কেতাকারে বার্তা পাঠাতে পারেন যে কোন একটি মাধ্যম ব্যবহার করে।** এখানে প্রেরক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রথম সেতু। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে একজন প্রেরক ইমেইল কিংবা মেসেজের মাধ্যমে কোন একটি বিষয়ের উপর কারো কাছে মতামত (Feedback) চাইতে পারেন।

- **বার্তা যিনি গ্রহণ করেন তিনিই গ্রহীতা।** গ্রহীতার কাছে বার্তা অর্থবহ হলেই তিনি তা গ্রহণ করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যদি কেউ সরাসরি আপনার দিকে চোখ রেখে, হেসে কিংবা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কিছু একটা বলেন তখন গ্রহীতা উপলব্ধি করতে পারেন যে এটি তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে। বার্তা মৌখিক কিংবা অমৌখিক যাই হোক না কেন তা অর্থবহ হতে হবে।
- **বার্তায় একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থ বা কোনো নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে হয়।** বার্তা ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত, মৌখিক কিংবা অমৌখিক যে কোন কিছু হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আপনি কোথাও হেটে যাচ্ছেন, পেছনে পেছনে হয়তো আপনার চেনা জানা কেউ আসছে। যখন আপনার এই

ব্যক্তির সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ হবে এবং আপনি সৌজন্যমূলক কিছু একটা বলবেন তখনই গ্রহীতার কাছে বার্তা পৌঁছাবে, সেটি ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে।

- **চেনেল কিংবা মাধ্যম হচ্ছে একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করা হয়।** সাধারণভাবে মানুষ বার্তা পাঠাতে মৌখিক কিংবা অমৌখিক মাধ্যমকেই ব্যবহার করে।
- **যে কোন ধরণের ধ্বনি কিংবা গোলযোগ বার্তা প্রেরণ এবং গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।** Noise কিংবা ধ্বনি বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ দুভাবেই হতে পারে। বাহ্যিক বলতে বোঝায় মনে করুন আপনি কারো সাথে সরাসরি কিংবা ফোনে কথা বলছেন তখন রাস্তায় কেউ জোরে জোরে লাউডস্পীকার বাজিয়ে যাচ্ছে তখন স্বাভাবিকভাবেই বক্তা এবং শ্রোতার বার্তা আদান প্রদানে সমস্যা হবে। আভ্যন্তরীণ বলতে নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা বোঝায়। আপনার ক্ষুধা লেগেছে তখন কেউ এসে জটিল কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে মনোযোগের অভাব সৃষ্টি হয়। বাহ্যিক কিংবা আভ্যন্তরীণ যে কোন গোলমালই বার্তা বহনে সমস্যার সৃষ্টি করে।

লিনিয়ার মডেলের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল তা একরৈখিক দিক নির্দেশ করে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিংবা চিন্তন সংযোগের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে এ বিষয়ে ও এই মডেল কোনো কিছু বলেনি। দূরদর্শন এই মডেলের একটি ভালো উদাহরণ হতে পারে। কারণ আমরা কখনো দূরদর্শনের সাথে কথা বলতে পারি না। এখানে বার্তা গ্রহীতা শুধুমাত্র গ্রহণ করতে পারে, তাই এটি একরৈখিক। আমরা যদি আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর তা ব্যবহার করি তাহলে দেখব এখানে একজন শুধু বলছে এবং আরেকজন শুনছে। ব্যবহারিক জীবনে এটি যেমন অচল তেমনি অপ্রাসঙ্গিক।

লিনিয়ার মডেলের সমালোচনা করে বার্নলান্ড (Barnlund,1970) বলেছেন সংযোগ কখনো একরৈখিক হতে পারে না। এখানে বক্তা এবং শ্রোতার সামঞ্জস্য থাকতে হবে এবং তা হবে দ্বিবাচনিক। তিনি লিনিয়ার মডেলের সঙ্গে ট্রানসেকশনেল মডেলকে (Transactional Model) যুক্ত করার কথা বলেছেন ।

> "The transactional Model of Communication adds to the Linear Model by suggesting that both parties in a communication exchange act as both sender and receiver simultaneously, encoding and decoding messages to and from each other at the same time."[৬]

উপরোক্ত মডেলগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই সংযোগ কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোকপাত করে। যেমন- প্রেরক, গ্রহীতা, সংযোগের মাধ্যম, বার্তা, গোলমাল, প্রসঙ্গ (Context) এবং সংযোগের ফলাফল।

শ্যানন এবং ওয়েভার ১৯৪৯ সালে 'The Mathematical Theory of communication' নামে একটি বই প্রকাশ করেন, সেখানে সংযোগের মাধ্যমকে তারা গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। নিম্নে শ্যানন ও ওয়েভার মডেল এর চিত্র[৭]:

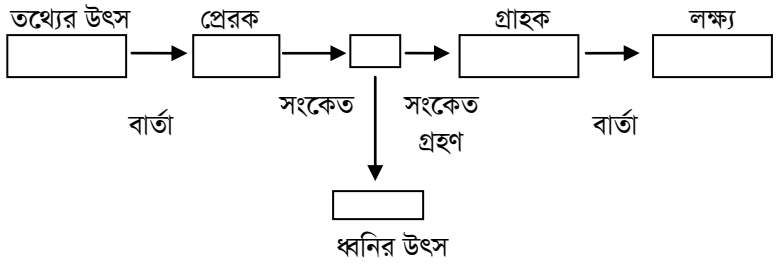

লেখকদ্বয় দুটি বিষয়ের উপর মূলত আলোপাত করেছেন:

(১) সংযোগের প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে গাণিতিক সূত্র ব্যবহার করে ।
(২) এই মডেলের সাহায্যে সংযোগের প্রক্রিয়ার নানা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব ।

শ্যানন ও ওয়েভার সামাজিক কিংবা মনস্তাত্ত্বিক সংযোগে আগ্রহী ছিলেন না। তারা এমন একটি সূত্র উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেছেন যেখানে সংযোগ একশ শতাংশ কার্যকরী হয়। আমরা উপরোক্ত রেখাচিত্রের পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই শ্যানন ও ওয়েভার অ্যারিস্টটল প্রদর্শিত সংজ্ঞাকেই অনুসরণ করেছেন। শুধুমাত্র পরিভাষা এখানে ভিন্ন হয়েছে। তবে এখানে একটি নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে ধ্বনি (Noise)। ওয়েভার বলেছেন, ধ্বনি বিকৃত হতে পারে (যেমন টেলিফোনের) অথবা স্থির (রেডিও) অথবা বিকৃত চিত্র এবং ধ্বনি হতে পারে (টেলিভিশন) অথবা শব্দ প্রেরণে ব্যাঘাত সৃষ্টি ইত্যাদি, শ্যানন ও ওয়েভার 'Noise' বলতে শাব্দিক ধ্বনির কথা (Semantic Noise) বলেছেন যা সংযোগে বাধা সৃষ্টি করে। শাব্দিক ধ্বনি একটি বিরাট সমস্যা কারণ একই ভাষা উচ্চারণগত কারণে দুই অঞ্চলে দুইভাবে বলা হয় ফলে একই ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও বুঝতে অসুবিধা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে চট্টগ্রামের বাঙালি আর কলকাতার বাঙালির ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারণ ও ধ্বনিগত কারণে এক অঞ্চলের ভাষা আরেক অঞ্চলের মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয়। সফল সংযোগ সাধনের জন্য উচ্চারণগত, ভাষাগত ও বাগধারাগত সামঞ্জস্য প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে থাকতে হবে ।

স্ক্রেম মডেল (Schramm's Model):

Wilbur Schramm যিনি সংযোগ তাত্ত্বিক হিসাবে বিখ্যাত, তিনি তাঁর 'The process and effects of mass Communications' বই এ সংযোগের একটি নতুন মডেলের কথা উল্লেখ করেছেন। স্ক্রেম লক্ষ্য করেছেন অ্যারিস্টটল মডেলে সর্বদা তিনটি উপাদানের প্রয়োজন হয় উৎস, বার্তা এবং গন্তব্য। আদর্শ অনুযায়ী উৎস বার্তাকে সঙ্কেতাকারে প্রকাশ করে এবং বার্তা তার গন্তব্যে পৌঁছায় যে কোনো একটি মাধ্যমকে অবলম্বন করে, এবং সেখানে বার্তা সঙ্কেতযুক্ত হয়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর লক্ষ্য রেখে তিনি বলেছেন বার্তা প্রেরক এবং গ্রাহকের মধ্যে যে কোনো একটি দিকের মিল থাকতে হবে। যদি উৎস এবং গন্তব্যের মধ্যে কোন কিছু আড়াল সৃষ্টি করে তাহলে সংযোগ ব্যহত হয়। স্ক্রেম তাঁর বইয়ে বিষয়টিকে নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন[৮]:

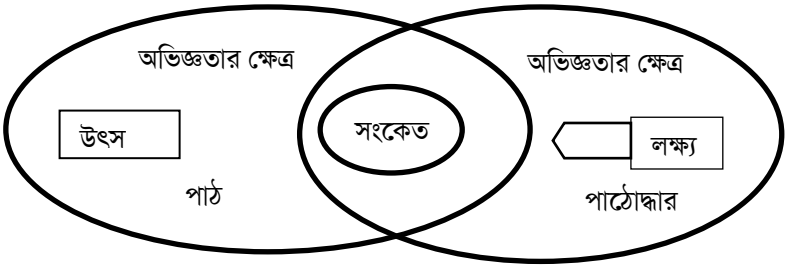

সংযোগ বা জ্ঞাপন মূলত দুধরনের:

১. লেখ্য সংযোগ

২. মৌখিক সংযোগ

সংযোগের মূল উদ্দেশ্য কোনো তথ্য অপরকে জানানো। তথ্য ছাড়াও নানা অনুভূতি প্রকাশ করাও সংযোগের উদ্দেশ্য। সংযোগের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কোন একটি বার্তা সম্পূর্ণ রূপে অন্যের কাছে পৌঁছানো। সংযোগ সাধনের ফলে কারো কথা মানুষ মন দিয়ে শুনে এবং বোঝে ও তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। সংযোগের তৃতীয় উদ্দেশ্য কোনো একটি বিষয়কে বিস্তারিতভাবে অন্যের কাছে তুলে ধরা। সেখানে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমেও কথা বার্তা হতে পারে। সংযোগের দ্বারা আমরা একজন আরেকজনকে ভালোভাবে বুঝতে পারি। আমাদের আবেগ, অনুভূতি অন্যের সাথে ভাগ করার ফলে দুটি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গভীরতা লাভ করে।

সংযোগের ব্যবহারিক রূপ:

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি একে অন্যের সাথে বিনিময় করা সংযোগের প্রধান কাজ। সংযোগের মাধ্যমেই একটি ব্যক্তি বা সংগঠন তার দৈনন্দিন ব্যক্তিগত কিংবা প্রশাসনিক কাজ সমাধান করে। সংযোগ ব্যবহারে ভাষা অন্যতম মাধ্যম। দুইজন ব্যক্তির মধ্যে ভাষিক ব্যবধান না থাকলে সঠিক তথ্য আদান-প্রদানে সাহায্য হয়। সংযোগের ব্যবহারের মাধ্যমেই দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সমন্বয় তৈরি হয় এবং কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। সংযোগের ব্যবহারের মাধ্যমেই আমরা তথ্য, ধারণা, মতামত, আদেশ, উপদেশ প্রভৃতি প্রয়োগ করতে পারি। সংযোগের মাধ্যমে প্রেরক প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রাহককে পাঠায় এবং গ্রাহক তার উপর ভিত্তি করেই মতামত প্রদান করে। সঠিক সংযোগ ব্যবহারের মাধ্যমেই একটি সংঘটন তার নীতি-নিয়ম, কাজের ধরণ প্রভৃতি তার সহকর্মীর উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করে। উপযুক্ত এবং ইতিবাচক সংযোগ ব্যবহার একটি সংঘটন এগিয়ে যাওয়ার চাবিকাঠি। সংযোগের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা অন্যের কাছে প্রকাশ পায়। ফলে ব্যক্তির পরিচয় অন্যের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়। সঠিক তথ্যাদি উপস্থাপন মানুষের চিন্তাশক্তিকে বিকশিত করে। তাই কারো কথা অন্যের কাছে প্রেরণার উৎস হতে পারে।

তথ্যসূত্র:

1) Smith, B. L., Lasswell, H., & casey, R. D. (1946) Propaganda, Communication and Public Opinion, Princeton, N.J: Princeton University Press, Page: 121)

2) Lee, R.L. (1993) Developing effective Communications (website). University of Missouri Extension. Available at: http://ectension.missouri.edu/p/CM109 (2017, November 5th)
3) ibid
4) Survey of Communication Study, Chapter-I, Foundations: Defining Communication and Communication Study, Page:3
5) Harold D. Lasswell, The structure and function of communication in society, The communication of Ideas, editor, Lyman Bryson, New york: Institute of Religious and Social Studies, Jewish Theological Seminary of America, 1948, page: 37
6) Survey of Communication Study, Chapter-I, Foundations: Defining Communication and Communication Study, Page:4
7) Claude F. Shannon and warren weaver, The Mathematical Theory of communication (Urbana-III: The university of Illionis Press, 1964, p.7
8) Wilbur Schramm, "How Communication works". The process and effects of Mass Communication, editor Wilbur Schramm (Urbana- III, The University of Illinois press 1961) pp-5-6